দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাসের সূচনা পর্যন্ত নক্সা ও নারীর পরিসর

বাংলা উপন্যাসের উম্মেদপর্যন্ত নারীর পরিসর আলোচনা করতে গেলে আমাদের প্রথমেই জানা দরকার ঠিক কোন পরিস্থিতিতে বাংলা উপন্যাসের জন্ম হয়েছে এবং আমাদের সমাজ কোন পথে এগিয়েছে।

(ক) উপন্যাস হচ্ছে লিখিত বর্ণনা। গল্প বলা থেকেই এর উদ্দেশ্য হয়েছে এবং এখনও সমানে উপন্যাসের জন্ম হচ্ছে। যেহেতু উপন্যাস লিখিত বর্ণনা তাই শিক্ষা না থাকলে ব্যক্তিবিশেষের উপন্যাস পাঠ করা সাধ্য নয়। ইংরেজি শিক্ষার বিপুল প্রসার এবং সেই সঙ্গে শিক্ষিত মধ্যবর্তী শ্রেণীর উত্তরের মধ্যেই উপন্যাসের বীজ নিহিত ছিল। শিক্ষিত না হলে উপন্যাস লিখিত সাধ্য নয়। গল্প থেকে যখন উপন্যাস জন্ম হয়, তখন তার জন্য প্রয়োজন হয় সমাজ-পটভূমি, স্থান এবং কালের বিশেষ পরিস্থিতি। সব দেশে উপন্যাসের জন্ম একই লগ্নে হয়নি। কোথাও তা হয়েছে অষ্টাদশ শতাব্দীতে কোথাও তা হয়েছে উনবিংশ শতাব্দীতে। কাজেই উনিশ শতকের সমাজের চেহারাটি আমাদের দেখে নিতে হবে, আর সেই সঙ্গে দেখতে হবে নারীর পরিসরও। কারণ সমাজ তো আর নারী বর্জিত নয়।

৫৮
ব্যক্তি ও সমাজ পরস্পর সাপেক্ষ। ব্যক্তিবর্গ নিয়েই তৈরি হয় সমাজ। আর তখনই সমাজে একটি প্রশাসন গড়ে ওঠে। কল্পভেদে, দেশভেদে এবং ব্যক্তিভেদে সেই প্রশাসনের পরিচালকরা কখনও ব্যক্তিগত পুরোহিত, কখনও করিয়া রাজা, কখনও আদিবাসী ধর্মগুলো, কখনও নির্বাচিত রাষ্ট্রপতি কখনও বাহিবলো বলীয়ান দুর্ভুত। ব্যক্তির মধ্যে স্বজনপোষণ, স্বাক্ষর প্রীতি এবং মতাদর্শের অনুসারীদের প্রতি পক্ষপাত থাকেই সেই সমাজবিধি সকলের জন্য এক হলেও কোন কোন ব্যক্তি সেই বিধির বিরুদ্ধে তার ব্যক্তিমানের স্বাক্ষর নিয়ে এক প্রশ্নচিহ্ন হয়ে উঠতে পারে। সমাজ ও ব্যক্তির এই দুটোমর সম্পর্কেই উপন্যাসের অর্থের উপাদান। যতদিন মানুষ সমাজবিধির বিরুদ্ধে কোন প্রশ্ন উত্থাপন করেনি, ততদিন উপন্যাসের জন্ম হয়নি।

(ক) সমাজের শ্রেণী বিভক্তিকরণ বছর প্রাচীন কাল থেকেই হয়ে আসছে।

cারণ মানব প্রাক্তন নিজেকে কোন একটি শ্রেণীভুক্ত করে দেখবার প্রবণতা জৈব প্রবণতার মতোই প্রাচীন। বিভিন্ন মানবগোষ্ঠীর মধ্যে অধিকার-এর সংখ্যাত — এটাই সমস্ত প্রাচীন গল্প। এই গল্পের মধ্য দিয়ে যখন উঠতে এসেছে কোন ব্যক্তির অথবা সমাজের নির্যাতিত শ্রেণীর কথা তখনই গল্প অথবা কাহিনী থেকে উপন্যাসের দিকে ঘটেছে তার পদক্ষেপ।

এই প্রতিবাদ আসে তখনই যখন মানুষ তার নিজের সম্পর্কে সচেতন হয়।

৫৯
আর এই সচেতনতা আসে শিক্ষা থেকে। শিক্ষা আসে বর্ণমালার উপর অধিকার থেকে। তাই ইউরোপে উপন্যাস এসেছে অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রথম দিকে। ভারতের অবস্থা অন্যরকম। ভারতে প্রকৃত গণশিক্ষা এখনও সম্পূর্ণ নয়। তবে তা বিত্তত হয়েছে বহুদূর। মিশনারিদের চেষ্টায় খুব অল্প মাত্রা হলেও দরিদ্র মানুষের মধ্যে লেখাপড়া ছড়িয়ে দেবার একটা প্রয়াস দেখা যায়। তার উদেশ্য যদিও ছিল খৃষ্টধর্মকে ছড়িয়ে দেওয়া তবু সাধারণ মানুষের মধ্যে ধর্মের মাধ্যমেই সেদিন বর্ণপরিচায় হয়েছিল। পিছনে পড়া মানুষের মধ্যে তথা মেয়েদের মধ্যে বর্ণমালার অধিকার ছড়িয়ে দেবার প্রথম প্রয়াস একেবারে বার্থ হয়নি। বিশেষ করে মেয়েদের মধ্যে বর্ণমালার অধিকার একটা সাধা জাগিয়েছিল নিশ্চয়ই। বাংলার মধ্যবিত্ত সমাজেও সেদিন অনুভব করেছিল — লেখাপড়া শিখতে হবে। সেই শিক্ষা ইংরেজি নির্ভর শিক্ষা — অর্থাৎ খানিকটা আধুনিক মনের স্পর্শ সেখানে আছে। এই প্রথম মানুষের মধ্যে ব্যক্তিত্বের জাগরণ ঘটলো। তাই পরিণতিতে সমাজবিধানের সামনে এক প্রশ্ন — কেন তার অধিকার সীমাবদ্ধ? এসবই ঘটেছিল উনিশ শতকে — তাই গল্প থেকে উপন্যাস এসেছে এদেশে উনিশ শতকেই।

ছাপাখানার আবিষ্কার উপন্যাসকে ছড়িয়ে দিয়েছিল গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে। এখনও আমরা বাটতলার বই বলে এক শ্রেণীর বইকে চিহ্নিত করি। এর মধ্যে ব্যাপ্তির মনোভাব আছে অর্থাৎ এখন আর এই সমস্ত বই পড়া যায়না। কিন্তু এই

৬০
বটতলাই একদিন মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা বিষ্ঠার একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা 
পালন করেছিল। অতীতের বাংলা কথা ঐতিহ্যের ধারাবাহিক খানার বচন বটতলা 
সাহিত্যের বহু পুস্তকে উদ্ধৃত হত। ১৮৭৫ সালে বরিশালের এমনি একটি বটতলা 
জাতীয় সন্তা ছাপাখানা থেকে বের হয়েছিল ‘নারীকুলের অবশ্য জাতব্য 
বিষয়সমূহ’। লেখিকা বসন্তকুমারী দাশী অবশ্য জাতব্য বলে একটি তালিকা 
দিয়েছেন,

“মচকানিতে চুন হলুদ 
পুড়লে দেবে ছাগল দুধ 
কাটলে চিতের পাতা চুর 
পচলে কেটে করবে দূর।”

এইসব প্রাচীন মেয়েলি জগতে চিকিৎসার ছড়া ছাড়াও আর একধরনের 
বই প্রকাশিত হতো যার উদেশ্য ছিল উনিশ শতকের বাঙালি মেয়েদের আচার 
আচরণে শিক্ষিত করে তোলা। ১৮৩৪ সালে নীলরতন হালদার রচিত ‘দম্পতি 
শিক্ষা’ নামে একটি বই বেরিয়েছিল যাতে স্বামী শ্রীর পারম্পরিক ব্যবহার ও 
কর্ত্তব্যের উপদেশ দেওয়া হয়। লেখক বলেছেন এইসব উপদেশ প্রাচীন 
শাস্ত্রেরত। ঠিক একই ধরণের আর একটি বই বের হয়। ১৮৫৪ সালে যাতে 
বিবাহিতা মহিলারা স্বামীর প্রতি কিরোকার কর্তব্য পালন করবেন, তার একটি তালিকা

৬১
দেওয়া হয়। বইটির নাম ‘পতিরতোপাখ্যান’ রচয়িতার নাম পাওয়া যায়নি। তবে রঙপুরের জমিদার কালী চৌধুরী এই বইটির প্রশংসাবৃদ্ধি লেখককে পুরস্কার দান করেন। এই লেখকও দাবি করেছেন যে তিনি যা লিখেছেন তা সবই শাস্ত্রসম্ভায।

প্রাচীন শাস্ত্র মানেই মনুর নির্দেশ। যাতে স্ত্রীকে স্বামীর পদানত হয়ে থাকতে হতো। বইটির নাম এবং বিষয়বস্তু থেকে এটাই বড় হয়ে উঠেছে। উল্লেখযোগ্য এই প্রবন্ধটা শুধু বটতলার হিন্দু লেখকদের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। সমসাময়িক মুসলমান লেখকদের বই-এ এ দেখা যায় সেখানেও অন্তর্গত মেয়েদের নিয়ন্ত্রণের জন্য তারা অতিমাত্রায় আগ্রহী। কলকাতার আহমদী প্রেস থেকে মুক্তিনাথ শেখ মুন্সী চম্পা বিভক্ত দোপাছি ‘বেদাবেল গাফেলিন’ (১৮৪৮) এ লেখক স্ত্রীকে উপদেশ দিলেন এই বলে যে তার মনে রাখা দরকার যে স্বামীই একমাত্র প্রভু এবং তাকে বিনা প্রতিদিনের দৈহিক ও মানসিক সরবরাহ পরিদৃষ্ট যে প্রাচীন করাই স্ত্রীর কর্তব্য।

তথাকথিত ‘দাম্পত্য শিক্ষা’ বা বিবাহিতা নারীর গার্হস্থ্য কর্তব্য ও স্বামীর প্রতি অবিচ্ছিন্ন ভক্তি ও তার সেবায়ত্তের দায়িত্ব পালনের উপর এই যে যোগ দেখা যায় তৎকালীন বটতলার পুরুষ লেখকদের রচনায়, তার সিদ্ধান্তে একটা সমাজক নিরাপত্তাবোধ ও আশন্না কার্যকর করছিল বলে মনে হয়। উনবিংশ শতাব্দীর
বাঙলাদেশের নারীদের জীবনে নীচুতারগের বিপর্যয় ও পরিবর্তন দেখা দিয়েছিল — যা আতীতের পিতৃতত্ত্বের সমাজব্যবস্থায় ফাটল ধরিয়েছিল। প্রথমত গ্রামীণ অর্থনীতির ধর্মসের ফলে দুর্ভিক্ষ, দারিদ্র্যবিদ্ধ অসংখ্য মহিলারা কলকাতা শহরে এসে বৈশ্যবৃত্তি গ্রহণ (যাদের মধ্যে অনেকই ছিলেন হিন্দু কুলীন বংশের বিধবা)। পিতৃতত্ত্বের আধিপত্যের সামনে একটা ভীতির কারণ বিস্ফোর হয়ে উঠেছিল।

আবার অন্যদিকে থেকে পাশাপাশি মূল্যবোধে শিক্ষা বিষয়ের প্রভাব নবার্থিক বাঙালিদের মধ্যে গ্রীষ্মের অধীনতার (তৎকালীন চিত্তাহারা অনুসারে) প্রচার রক্ষণশীল বাঙালিদের কাছে আসা অমন্তব বলে মনে হয়েছিল। বিবাহ বিবাহ, গ্রীষ্মের একটা বাঙালি সমাজপতিরা সুনজর দেখেননি। এই মনোভাবেরই ছাপ পাওয়া যায় বটতলার অনেক প্রহরে — যেমন রামকান্ত, সেনের ‘হর্দ্যকে বউ-এর বিষম জালা’ বা রাধাকৃষ্ণ হালদারের ‘পাস করা মাণ’। মুসলমান লেখকগণ ঘরের মহিলাকে সমাজ সংস্কার ও গ্রীষ্মকার প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য ঐতিহ্যের নানা প্রহর ও উপদেশমূলক পুস্তিকা চরণা করতেন।

উনিশ শতকে ইংরাজি ও বাংলায় প্রচুর পত্র পত্রিকা বের হয়েছিল। তার বেশিরভাগ অংশই এখান আর নেই, যা আছে তার সবাই লেখা ও পাওয়া সহজ নয়। এই অবস্থায় পত্র-পত্রিকা থেকে যতটুকু পাওয়া সহজ তার উপর নির্ভর করেই গবেষণা করতে হয়েছে। এই পত্র পত্রিকা থেকেই এই তথ্য পাওয়া যায়।
যে — পূর্বশাসিত সমাজে বাঙালি নারী প্রায় সমস্ত রকম মানবিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিলেন। হিন্দু মৌলাদের মতো মুসলমান মৌলাদের অবস্থাও করণ ছিল। ১৮৮২ সালের নভেম্বর মাসে ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকায় মুসলমান মৌলাদের দূরবস্থায় চিত্র তুলে ধরা হয়। সতীপ্রথা, বিধবাবিবাহ, বহুবিবাহ, কৌশলীন্ত প্রথা বাল্যবিবাহ, সহবস সম্পত্তি ও পণপ্রথাকে টিক্কা করে বিভিন্ন নারীকেন্দ্রিক আন্দোলনের যে সৃষ্টি ছিল তার বিস্তৃত খবর ইংরেজি ও বাংলা পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। রক্ষণশীলতার পাশাপাশি প্রগতিশীলতার ধারা প্রবর্ধন হয়। এই প্রেক্ষাপটেই বাঙালি নারী জাগরণের সূচনা হয়। হিন্দু সমাজের সঙ্গে মুসলিম সমাজের কোন কোন ক্ষেত্রে পার্থক্য ছিল। অন্যদিকে বিধবা বিবাহ শাস্ত্রসমত কিছু তাই নিয়ে দীর্ঘদিন বিতর্ক চলে। পাঠক নিশ্চয়ই ভুলে যাননি যে বাংলা উপন্যাসের জনক বক্সম্যানের হাতে ‘কুন্ডনদিনী’ এবং ‘রোহিনী’র করণ ইতিহাস। বিধবা বিবাহ উচিত কিনা এই নিয়ে বহ পণ্ডিত তর্কে প্রবৃত্ত হয়েছিলেন সেদিন। ইশখরচন্দ্র বিদ্যাসাগরই এই ব্যক্তিত্ব যিনি বিধবা বিবাহকে শাস্ত্রসমত বলে শাশ্বনুসারেই বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করেন। তখন বাংলায় যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়, তার বিবরণ বিভিন্ন পত্র পত্রিকায় পাওয়া যায়। হিন্দু সমাজের রক্ষণশীলতা এতই প্রবল ছিল যে ক্রান্তারও তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যে বিধবা বিবাহ প্রবর্তন করতে সম্মত হননি। শিক্ষিত হিন্দু সম্প্রদায়ের অনেকেই বিদ্যাসাগরের তীর সমালোচনা করেন। তৎকালীন সংবাদপত্রে তার খবরও রয়েছে।

৬৪
কিন্তু এটাও আমরা লক্ষ্য করি যে অগ্রসর বাঙালি বুদ্ধিজীবীরা ও তারা সময় রক্ষণশীলতার সঙ্গে আগামি প্রথা অপর্যাপ্ত হয়ে কলঙ্কিত হন।

উদিকের বিশিষ্ট ব্যক্তির পরিবারিক জীবনের দিকে তাকালেই তা 'প্রফুল্ল হয়ে ওঠে। অবশ্য হিন্দু সমাজের মধ্যে থেকেই বহু বিবাহ ও কোলিনয় প্রথা শোধনী আদর্শ ও বাল্যবিবাহ শোধনী আদর্শ সন্ধান করতে হয়। 'ঢাকা ক্যাডে' পত্রিকায় লেখা হয়: 'Kulin has remained a beast.' 'সঙ্গীতনী' পত্রিকায় বহুবিবাহকারীদের একটি বিতর্কিত তালিকা বের হয়েছিল। তাদের ত্রীয়ের সংখ্যা ও তাদের উল্লেখিত হয়। হিন্দু সমাজের এই কুৎসিত প্রথার বিরুদ্ধে আদর্শ সন্ধান করতে হলে স্বাভাবিকভাবেই কোলিনয় প্রথা প্রবর্তনের জন্য বল্লাল সেন নিষ্ঠিত হন।

বাল্যবিবাহকে একটি পাপপ্রথা বলা হয়। কোনও কোনও পত্রিকায় এমন কথাও লেখা হয় যে,

“রমণীদের অস্থখয়ঃ বিবাহ হওয়াই বিজ্ঞান ও ধর্মনুমোদিত। পৃথ্বীর নিতান্ত অন্ধকারে বিবাহ হওয়া কর্তব্য নাহে।’’

‘Age of Consent Bill’ অথবা ‘সহস্রাব্দের সমাজালোক বিপ্লবের বিল’

৬৫
নিয়ে যে বিতর্ক হয় তার সব খবরই সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। বৃদ্ধ বয়সে হরি
মহিতি বারো বছরের বালিকা ফুলমণিকে বিয়ে করেন। বিয়ের দিন রাত্রেই
ফুলমণি মারা যায়। এই ঘটনায় সারা বাঙ্গলা আলোড়িত হয়। হরি মহিতির
একবছর শষ্ম কারাদণ্ড হয়। সহাবাসের বয়স বৃদ্ধির পক্ষে যারা ছিলেন তারা।
সম্মতি আইনের পক্ষে ভাবা সম্মতি করেন। সম্মতি আইনের বিরোধী পার্টিরা
বলেন: সহাবাসের বয়স বৃদ্ধি করলে হিন্দুধর্মের উপর হস্তক্ষেপ করা হবে। এই
বিলের যারা বিরোধীতা করেন তাদের মধ্যেও উল্লেখযোগ্য ছিলেন ঈশ্বরচন্দ্র
বিদ্যাসাগর, আদি ব্রাহ্মসমাজের সভাপতি রাজনারায়ণ বসু, দ্বারভাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ,
এবং উমেশ চন্দ্র ব্যানাজী। সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এই বিল সমর্থন করলেও সহাবাস
সম্মতির বয়স বৃদ্ধি করলে অসুবিধা হতে পারে এই মতও ব্যাখ্যা করেন। অন্যদিকে
প্রতিবেদি এই বাবস্থা মুসলমানদের শাস্ত্রেরও ব্যবহারের বিরুদ্ধে নয় বলে মুসলিম
দেবুবৃন্দ তার বিরোধিতা করেননি। নবাব আব্দুল লতিফ খাঁর বক্তব্য থেকেই তা
জানা যায়। মুসলিম সমাজ 'সম্মতি আইন' বিষয়ক বিতর্ক থেকে নিজেদের দৃষ্ট
বজায় রাখেন। ১৮৯১ সালের ২০শে মার্চ Age of Consent Bill আইনে
পরিণত হয়। 'সম্মতির বয়স' দশ বছর থেকে বারো বছর করা হয়। পশ্চিমবঙ্গ
স্টেট আর্থিকভাবে এ সংরক্ষিত Age of Consent Bill বিষয়ক একটি
বড় ফাইল থেকে সেই সময়ের বিতর্ক সম্পর্কে বহু তথ্য পাওয়া যায়। উৎসাহী
গবেষক আরও বিস্তৃত জানার জন্য সেই ফাইলগুলি দেখতে পারেন।

৬৬
পণপ্রথার বিরুদ্ধে বিহারনিবাসী কলকাতায় বসবাসকারী মুনী পারীলাল আদেশ দেন সংগঠিত করেন। আরও যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন, তারা হলেন রাজা যতিন্দ্রমোহন ঠাকুর, রাজা রমানাথ ঠাকুর, রাজা নরেন্দ্রকৃষ্ণ, রাজেন্দ্রলাল মিত্র ও কৃষ্ণদাস পাল। বিবাহে যে প্রচুর অর্থ ব্যয় হতো সেই বিবাহেও অনেক খবর প্রকাশিত হয়। ১৮৯৫ সালে প্রকাশিত ‘Report on Native papers’ পণপ্রথার উপর প্রভৃতি আলোকপাত করে।

এই পরিবেশের মধ্যেই শিক্ষকর মাধ্যমে বাঙ্গালী নারীঅভিযানের সূচনা হয়। পুরুষদের শিক্ষার জন্যই সরকার বেশি আগ্রহী ছিলেন। শাসন ব্যবস্থার জন্যই কেরানি তৈরি করা প্রয়োজন ছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে শ্রীশিক্ষা খুব জরুরী ছিল না, তাই শ্রীশিক্ষার অগ্রগতি খুব মন্দ গতিতে অগ্রসর হচ্ছিল। ১৮৯০-৯১ সালের ‘শিক্ষা বিবরণী’ থেকে শ্রীশিক্ষার অগ্রগতির চিত্র পাওয়া যায়। এই সময়ে দেশীয় বালিকা বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল ২২৩৮ এবং ছাত্রী সংখ্যা ছিল ৭৮, ৮৬৫। মেয়েরা উচ্চশিক্ষা লাভ করেন, ডাক্তারও হন। এই সব খবর নিঃসনদেহে শ্রীশিক্ষার প্রতি গভীর আগ্রহেরই খবর। ১৮৯৩ সালের বামাবোধিনী পত্রিকায় কাদাধীন গদোপাধ্যায় এর এডিটরীয়ার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চিকিৎসা শাস্ত্রে উচ্চ উপাধি লাভের খবর গুরুত্ব সহকারে প্রকাশিত হয়।

১৮৯৮ সালের এপ্রিল মাসের ‘বামাবোধিনী’ পত্রিকা থেকে জানা যায় যে,
মুরিশাদাবাদের নবাব বেগম এর বদন্তায় কলকাতায় ১১নং রবিবসন স্ট্রীটে মুসলমান মেয়েদের জন্য একটি বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। এবং এক বছরে ৪৬জন বালিকা ভর্তি হয়। ২৩শে মার্চ এই বিদ্যালয়ের প্রথম বার্ষিক পরিতোষিক বিতরণ অনুষ্ঠান সম্পন্ন হয়। স্যার জন্ম উডবার্ন এই অনুষ্ঠানের সভাপতি ছিলেন এবং চীফ জাস্টিসের পদ্ধত লেডি ম্যাক্সেলিন পুরষ্কার বিতরণ করেন। কলকাতায় মুসলিম মেয়েদের বিদ্যালয়ের উদ্বোধন করে বামারোমিনী পত্রিকা।

বাঙ্লায় মেয়েদের চিত্তা চেতনার জগৎ এর ব্যাপ্তির পরিচয় সংবাদপত্রের মাধ্যমে পাওয়া যায়। সংবাদপত্রে মেয়েদের লেখা বের হয়। গ্রন্থ রচনাতে ও পত্র পত্রিকা সম্পাদনার মতো মেয়েদের আবির্ভাব ঘটে। ১৮৫৬ সাল থেকে সব লেখিকার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল কৃষ্ণমোহনী, দাসী, কৈলাসবাবী ও পুত্র, ফজলাদী চৌধুরাণী, স্বর্ণকুমারী দেবী ও আরও অনেকে। বাঙ্লায় মেয়েদের দুর্ঘুত বেদনার কথা, স্বাধীনতার বিষয়, শ্রীশিকার প্রত্যাজনিয়তা আলোচনা করে রোজা বালিকা বিদ্যালয়ের প্রথম শ্রেণীর ছাত্রী।

বিবি তাহেরুমেহা লিখিত একটি পত্র ১৮৬৫ সালের মার্চ মাসের ‘বামারোমিনী’ পত্রিকায় বের হয়। আমাদের মনে রাখা উচিত যে মুসলিম সমাজে মেয়েদের মধ্যে শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিতে ফয়জলাদী চৌধুরাণীর অপরিসীম প্রচেষ্টা ব্যবহার হয়নি। তারই চেষ্টা ও আর্থিক সাহায্যে কুমিল্লায় একটি উচ্চ ইংরাজি
বিদ্যালয় ও মেয়েদের জন্য একটি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। তিনি মেয়েদের জন্য দাতব্য হাসপাতালও স্থাপন করেন।

শিক্ষার প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে কর্মক্ষেত্রেও মেয়েদের অবিভাজ্য ঘটন। বালিকা বিদ্যালয়ে তারা কর্মরত হন। কলেজেও অধ্যাপনার কাজ তারা যোগদান করেন। ১৮৮৪ সালে ৭৫ টাকা বেতনে চন্দ্রমুখী বসু এম. এ. বেঙ্গল বিদ্যালয়ের সহকারী সুপারিন্টেন্ডেন্ট পদে নিযুক্ত হন। স্বর্ণকুমারী দেবীর কন্যা। সরলা দেবী মহীশূর মহারানী কলেজের অধ্যাপিকা ছিলেন। পরে তিনি ৪৫০ টাকা বেতনে বরদার মহারানির প্রাইভেট সেক্রেটারি হন। নিজেরা পছন্দ করে বিবাহ করেন, এমন প্রতিবাদী নারীর কঠোর সংগরহ শোনা যায়। যমুনীর অত্যাচার থেকে রক্ষা পাবার জন্য হিন্দু মহিলারা আইনের শরণাপন্ন হচ্ছেন, এমন নজরের পাওয়া যায়। ১৮৭১ সালের হিন্দু দীর্ঘমের সমতি ও প্রকাশ জনজীবনে মেয়েদের অংশগ্রহণ লক্ষ্য করা যায়। কেশবচন্দ্র সেন স্থাপিত নারী সমাজে মেয়েরা অংশগ্রহণ করেন।

আনন্দমোহন বসু তার বাড়িতে মিস্ মেরি কারেন্টারের স্মৃতির প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের জন্য যে সভার আয়োজন করেন তাতে শিক্ষিত মহিলারা স্মৃতিচারণ করেন। হিন্দু নারীদের উল্লেখিত উদ্দেশ্যে 'আর্য নারী সমাজ' নামে একটি সংস্থা স্থাপিত হয়। 'বঙ্গ মহিলা সভা' ত্রী সাধীনতার পক্ষপাতী ছিল। মুদ্রণযাপনের সাধীনতা পুনরায় প্রবর্তন করায় লড়াই রিপোর্ট বন্ধ করার জন্য ১৮৮২ সালের ১২ই
ফেরুয়ারি কলকাতার টাউন হলে যে সভা হয়, তাতে ছয়জন বাঙালি মহিলা উপস্থিত ছিলেন। হিন্দু পরিবারের মেয়েদের মধ্যে শিক্ষা প্রসারের উদ্দেশ্যে ১৮৮৬ সালে সহী সমিতি স্থাপিত হয়। এই সমিতি সম্পর্কেও বিবেচ্য খবর সংবাদপত্রে ছাপা হয়।

১৮৫৭ সাল থেকে বিশিষ্ট পরিবারের স্ত্রীরা মারা গেলে তাদের মৃত্যু সংবাদ সংবাদপত্রে ছাপা হতো। ১৮৫৪ সাল থেকেই বারবনিটাদের সমস্যা ও সামরিক দৃষ্টিভঙ্গী সম্পর্কে আলোচনা লক্ষ্য করা যায়। এই বিষয়ে 'Report on Native papers' এ বহু তথ্য পাওয়া যায়। তখন বারবনিটাদের জন্য কলকাতায় কোন পৃথক এলাকা ছিল না। তাদের কন্ধাচর ও দৌরান্তে গৃহহরা অত্যন্ত উত্তেজিত হয়।’ ১৮৩৬ সালে আইন প্রবর্তনের পর বারবনিটাদের সম্পর্কে সরকার ব্যবস্থা নেয়। এই আইন নিয়েও সংবাদপত্রে বিবেচ্য আলোচনা চলে।

'সুরচিতসত্তা' কলকাতায় বেশ্যাদমনের জন্য উদ্যোগী হয়। কন্যা অপহরণ, নরহত্যা ইত্যাদি নানা অপরাধমূলক কাজে মোতায়েদের লিপ্ত হতে দেখা যায়। কেন কলকাতায় এত বারবনিটার উদ্দেশ্য এবং অপরাধমূলক কাজ আহ্বানিয়োগ — এসবের উদ্দেশ্য সংবাদপত্রের পাতায় পাওয়া যায় না, ঘটনার বিবরণ যথাযথ থাকে।

আমাদের গবেষণায় যেহেতু আমরা উদিনিশ শতকের নক্ষত্রলোকেই নিয়েছি
— যেখানে গুহধূ ছাড়া নারী মাত্রই বারবণিতা আর কদাচারের লিপ্ত। এরকম মনোভাবের পিছনে কি কারণ থাকতে পারে তা খুঁজে দেখাও আমাদের কর্তব্য।

এই নারী কোন ভুঁইফোড় চরিত্র নয়, এরা সমাজেরই। সমাজ থেকেই এদের উৎপত্তি, সমাজ থেকেই এদের জীবিকা, সমাজ থেকেই এদের পরিপূর্ণ। অতএব সমসাময়িক সমাজ অধ্যননিতির চেহারাটাও আমাদের একবার দেখে নিতে হয় না।

অধ্যননিতির পরিবর্তন খুব দ্রুত আমাদের মূল্যবোধকে পাতে দিচ্ছিল।
কোম্পানির শাসন থেকে রাগীর শাসন, আমাদের অধ্যননিতি চালচিত্রকে কোথাও বদলায়িনি। গ্রাম দ্রুত শহর থেকে দূরে সরে যায়। সরকারী কেন্দ্র হয়ে থাকতে শহর। শহরেই রোন্দার, শহরেই চাকরি, শহরেই শিক্ষা, শহরেই সরকারী পাওয়া যায়, এইরকম একটি মনোভাব আমাদের সদিন তাড়া করছিল।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই ঔপনিবেশিক অধ্যননিতির যে বিশেষ চেহারা — কৃষিপণ্যের বাণিজ্য মন্দির জন্য কৃষকের পরাধীনতা বৃদ্ধি সারা দেশেই লক্ষ্য করা যায়। আগাম খান্নার জন্য বা প্রাথমিক প্রয়োজনে ধার, পণ। বিক্রয় করবার জন্য মধ্যবর্তী ব্যবসায়ী শ্রেণীর উপর নির্ভরতার ফলে বর্ধন ও গরিব কৃষকের মধ্যে দূরত্ব বাড়তে থাকে। তার ফলে গরিব কৃষকরা অনেকেই গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসে কোন কাজের আশায়। কৃষক পরিবারের

৭১
মহিলাদের অবস্থা এই পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে আরও মারাত্মক হয়ে ওঠে। ১৮৬৮ সালে ‘সমাচার দর্পণ’র একটি চিঠি থেকে জানা যায় যে — যেসব প্রাণের
পরিবারের মহিলারা সূতো কেটে জীবিকা নির্বাহ করতেন, ইংল্যাণ্ড থেকে সূতো
আসার ফলে তা বন্ধ হয়ে যায়। এই ধরণের আরও কিছু কাজ ছিল যা উচ্চ বর্ণের
মহিলারা করতেন, এবং ঘরে বসেই এই সব বিধবা মহিলারা নিজস্ব কিছু উপার্জন
থেকে জীবিকা নির্বাহ করতে পারতেন — তাও উপনিবেশিক অধঃনীতির
চোরাবালিতে হারিয়ে গেল।

১৮৮১ সালে ইংল্যাণ্ডের ফ্যাস্টিরি অ্যাক্ট চালু হওয়ার ফলে বেশ কিছু সংখ্যক
বাঙ্গালি মহিলা ও শিশু কাজ পায় ফ্যাস্টিরিতে। কিন্তু যেহেতু এদের কোন কাজের
শিক্ষা হতো না, তাই এদের শ্রমশক্তির বিনিময় মূল্য ছিল পুরুষদের তুলনায়
অনেক কম। তবু গ্রামে থাকা যখন তাদের পক্ষে অসাধারণ হয়ে উঠল তখন তারা
বাধ্য হতেন কাজের জন্য শহরে আসতে। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এই মহিলারা শ্রমকাজের
ছিলেন উচ্চবর্ণের বিধবা বা স্বামী পরিত্যক্ত স্ত্রী নয়তো। খেটে খাওয়া মহিলা যারা
গ্রামে গোয়ালিনী, নাপিতানী ইত্যাদি কাজই করতেন। অনেক সময় গ্রাম থেকে
শহরে কাজের খোঁজ এসে কারখানায় কাজ না পেয়ে এরই ভুললোকের বাড়িতে
রাখার ও অন্যান্য কাজের জন্য পরিচারিকার কাজ পেতেন। প্রায় একই ধরনের
কাজ না পেয়ে বেশ্যাবৃত্তি গ্রহণ করতে বাধ্য হতেন। ১৮৮১ সালের খতিয়ান

৭২
In Bengal the population class seems to be chiefly recruited from the rural Hindu widows. The prominence of Hindu women among the prostitutes of Bengal often it is started women of good caste and even that in distribute were a large Mohamedan population predominates in the most curious featur disclosed in the correspondence and quite different from what the lieutenant governor believe to be the state of things in other parts of Northern India."
1864-69 এর মধ্যে সব ধরনের বেশ্যাকে পুলিশ থানাতে গিয়ে নাম লেখাতে বলা হয়। যে আইন পাস হয় তাকে বলা হয় ‘Contagious Diseases Act’। বাংলায় একে বলা হতো ১৪ আইন। মূলত বৃত্তিয়ী সৈন্যদের সিফিলিস ও গাণোরিয়ার মতো রোগের হার থেকে বাঁচানোর জন্য তৈরি হলেও পরবর্তীকালে ১৮৬৮ সালে কলকাতার সমস্ত মানুষকে রক্ষা করার জন্য সবধরনের বেশ্যাকে, বেশ্যালয়ের মালিককে ও দালালকে এই আইনের আওতায় আনা হয়। এর ফলে যেসব সারণি তৈরি হয় তাতে কাজের বেশ্যা বলে এই নিয়েও বহু আলোচনার সূত্রপাত ঘটল সরকারি মহলে। একদিকে উচ্চপদস্থ বাঙালি অফিসারদের লাগানো হল এই কাজে (যাদের মধ্যে বক্ষিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ও ছিলেন) অন্যদিকে বিনেতের নিয়ম কানুন প্রয়োগ করা হয় এদেশে। এর ফলে দুই ধরনের পরস্পরবিরোধী মনোভাব গড়ে ওঠে। বৃত্তিয় সরকারি অফিসাররা মনে করতে থাকেন যে নেটিভ মহিলারা বিশেষ করে বেশ্যারা সবাই সংক্রামক রোগের বীজ বহন করেন এবং সুযোগ পেলেই ইংরেজদের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে চান। অপ্রাণয় শতরকের ‘নেটিভ নচ্চালূ’ সম্পর্কিত যেসব ধারণা একসময় বিদেশী প্রভুদের আকৃষ্ট করতো, এদেশের মেয়েদের প্রতি তা অনেকটা কমে যায়। ‘নেটিভ’ মানেই মনে করা হতো নোংরা, অসংখ্য আর অসাধু। ‘নেটিভ বেশ্যা’ একই সঙ্গে সবরকম দোষের প্রতিরূপ। যারা ছিল একদিন চরম আকর্ষণের তারাই হয়ে গেল বর্জনের যোগ্য।

74
উনিশ শতকের বাঙালি ভ্রমলোকদের কাছে এই সমস্যা দেখা গেল সম্পূর্ণ অন্যভাবে। বৃটিশ সরকার ভারতীয় নারীদের উদাহরণ তুলে ভারতীয় পুরুষদের সামাজিক অবস্থানের কৃতিগুলো চোখে আঙুল দিয়ে দেখালেন। যে বাঙালি মধ্যবিত্ত শ্রেণীর পুরুষরা একদিকে সাহেব প্রভুদের খুশি করতে চান, অন্যদিকে সামাজিক নেতার ভূমিকা ত্যাগ করতে চান না তাদের রাগের গুরুত্ব পড়ে এই অর্কফলীয়ের উপর। প্রাচীনপন্থীরা তো প্রকাশেই সামাজিক সব দোষের জন্য নারীর শিক্ষা, তাকে ঘরের বাইরে আনার প্রচেষ্টাকে দায়ি করেন। ” আমাদের দেশ যতই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা দূর হতে থাকে বাঙালি বাবুরা সাহেবদের বকুনী লাথি ও কানমলা থেয়ে ‘গৃহকে’ একমাত্র আশ্রয় বলে অবলম্বন করেন।

উনিশ শতকের মাঝামাঝি থেকেই বড় অবস্থাপন্ন পরিবারের চাকুরিতে মানুষ কলকাতা শহরে বাড়ি তৈরি করেন। এই বাড়িগুলোয় স্থাপত্যের মধ্যেও এক বিশেষ পরিচয় রয়েছে আমাদের মানসিকতার। ‘গৃহ’ বলতে কি বুঝি তা এই সময়কার স্থাপত্যকলা থেকেই আমরা বুঝেছিলাম। বক্ষমচন্দ্রের ‘বিষবৃক্ষ’ উপন্যাসে নগেন্দ্রনাথের বাড়ির বর্ণনা আমাদের এই প্রসঙ্গে মনে আসে। ‘ঘর পেরিয়ে ঘর’ এই ধারণা আমরা তখন থেকেই বহন করে আসছি ‘গৃহ’ সম্পর্কে মনোভাবে। বাড়ির সামনেই থাকতো বাবুর বৈঠকখানা। (যা প্রামে ছিল কাছারি বাড়ি)। এর পরেই থাকতো খোলা উঠান এবং বিশাল বাড়ান্ডা যা যুক্ত করতো।

৭৫
বাড়ির পিছনের অংশের সঙ্গে সামনের অংশকে। এই পিছনের অংশটি হচ্ছে বাড়ির অন্দরমহল। এই অন্দরমহলটিই গৃহের প্রধান অংশ। এইখানেই রায়ার, শয়নকক্ষ ইত্যাদি। এই অংশটিকে সাজিয়ে ওঃছিয়ে মনোরম করে রাখার জন্য একাধিক মহিলা পাঠ্য বাই লেখা হয় — যেমন ‘গৃহলক্ষ্মী’, ‘সুগৃহিণী’ ইত্যাদি।

অন্যদিকে গ্রামে মহিলাদের যে সহজ চলাচলেরা ছিল, যার ফলে জমিদার বাড়ির মহিলাদের সঙ্গে গ্রামের গরীব মহিলাদের যে যোগাযোগ ছিল তাও বক্স হয়ে গেল। একমাত্র যারা শহরে এসে কায়িক পরিশ্রম করে দিন চলাচলেন তাদেরই এই অন্দরমহল ও বাইরের মহলের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা সম্ভব ছিল। ত্রিশিক্ষা বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে প্রগতিশীল পুরুষরাও তাদের বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে বাইরের মেয়েদের যোগাযোগ ঠিক পছন্দ করতেন না। তাদের কাছেও নারীর অশিক্ষা আর কুসংস্কারের মূলেও ছিলেন এই সব মহিলারা। এইভাবেই অন্দরমহলের সঙ্গে বাইরের যে যোগাযোগ ব্যবস্থাগুলি ছিল তাও চলে গেল পুরুষদের হাতে।

ত্রিশিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে গৃহের গিরে নারীর যে শ্রম তার অন্য ব্যাখ্যা করা হল।

উপস্থিত সজ্জিত মানেই রুচিসম্পন্ন এটাই ধরে নেওয়া হল। ফলে আগে যে ধরণের মেয়েলি গান, বৈশ্যলীর কথকতা, পাচালি পড়া, হেঁয়ালি অন্দরমহলে চালু ছিল — তা ভদ্রসমাজ ক্রমশ বাতিল করত থাকলো অশ্লীল বলে।

অন্যদিকে প্রাচীনপশ্চীন তাদের ত্রীকে গ্রামে রেখে কলকাতায় বাইটী এবং

৭৬
পরে ‘উপপত্নী’ ও ‘বেশ্যা’ রাখা শুরু করেন। অন্যথায় গ্রীবের শহরে আনলেও বাড়ির মেয়েদের সঙ্গে বাইরের সব যোগাযোগকে তারা সন্দেহের চোখে দেখতে থাকেন ও তা বন্ধ করার জন্য তারা সবরকম চেষ্টা চালিয়ে যান। এক বিশেষ ভয় কুলের মর্যাদা-অমর্যাদা তাদের সবসময় ভীত রাখত। যেহেতু নারীর মাধ্যমেই কুল রক্ষা হয়, অতএব গ্রীব যৌন শুচিতা রক্ষা করাই তাদের একমাত্র কর্তব্য ছিল। এর ফলে দুটি পরস্পর বিরোধী মতামত একত্রে মিলিত হয়ে যায় ‘নারী’ সম্পর্কে। গৃহে কেন্দ্র করে জীবনযাত্রার যে আদর্শ গড়ে ওঠে তা নারীর কারিক অমকে কোন মর্যাদা দেয়না। গৃহিণী হয়ে যান এক অধ্যাত্মিক শক্তির আকর। গৃহক্ষমই তাঁর একমাত্র ধর্ম হয়ে দাঁড়ায়। এর মধ্যে পতির সেবা ও সহায়তার লালন পালনও তার অবশ্য করতে হয়ে আওতায় চলে আসে। তার আসল কাজ নিজের এবং পরিবারের সবার নৈতিক আদর্শকে বজায় রাখা।

অন্যদিকে যেসব শ্রমজীবি মহিলা কারিক পরিশ্রমের বদলে অর্থ দাবি করেন, তাদের কোন দায়িত্ব নিতে সমাজ অধীকার করে। বিধবা, স্বামী পরিত্যাগ ও নিম্নবর্গের মহিলারা সবাই হয়ে দাঁড়ান অস্বীকার। — তারা সমাজের বোঝা। ১৮৮১ থেকে ১৯২১ পর্যন্ত জনসংখ্যার সারণি দেখলে বোঝা যায় যে গণপূর্ব পুরুষের অনুপাতে শ্রীলোকের সংখ্যা সমান শীঘ্রই কমছে। এটা হয়েছে কারণ প্রথাগতভাবে মেয়েদের কম পৃষ্ঠির ব্যবস্থা করে বেশি খাটিয়ে, শিশু অবস্থায় ।

৭৭
অবহেলায় মেরে ফেলে পুরুষের প্রাধান্য বজায় রাখা হয়েছে। আর একই সঙ্গে হয়েছে নারীর কাজিক শ্রমের অবমুক্তিয়ায়।

এইভাবে নারীর যা সৃজনশীলতা ছিল — বৈষ্ণবীদের কথকতা ও গান, বাঙ্গালীর নাচ, মহিলাদের নিজস্ব ছড়া, পালাগান রচনা, তাও বাঁধিল হয়ে গেল। তখন এইসব মহিলাদের অত্যন্ত করা হল বেশার দলে। এখানে বৃটিশ সরকারের মনোভাব ও হিন্দু সমাজগতির মনোভাব এক হয়ে গেল। বেশা মার্কি সে পাপে নিমগ্ন এবং কুলবধূ না হলেই সে কুলটা — যার যাত্রা শেষ বেশার পার্থীত। এই বাণ্ডা ছয়ই মেনে নিয়েছিলেন প্রহসনকাররা। এই ছয়কে নারীকে ফেলার বৈধব্যের ব্যাবস্থা তারা সংগ্রহ করেছিলেন মনু থেকে। এই ছয়কে ফেলে সব নারী চরিত্রকেই তারা বানিয়েছেন টাইপ চরিত্র। তাই নজর নারীর প্রতিবাদ বা আমোদনের স্থান প্রায় নেই। স্থান নেই কোন পরিবর্তনের। তাই শ্রেণীবদ্ধ সমাজে শিক্ষিত আধাশিক্ষিত প্রহসনকারের সামাজিক অবস্থান ভিন্ন হলেও তারা একই মতাদর্শের দ্বারা পরিচালিত। নৈতিকতার দোহাই দিয়ে তারা রচনা করেন নারীর এক বিশেষ মূর্তিকল্প — সেখানে তার কোন ইতিহাস নেই। কোন নিজস্ব চেহারাও নেই। কায়াহীন এই নারী যশ্রাজিলালের মতো পাপ করার জন্যই প্রস্তুত। তাকে নীতিপথে চালিত করার জন্যই গৃহে আটকে রাখা প্রয়োজন। গৃহের বাইরে এলেই সে পরিণত হয় কুলটা।
তাই বাংলা উপন্যাসের উম্মেদপর্বে নারীর সামাজিক অবস্থান — হয় তারা সতী সাধী স্ত্রী নয়তো কুলটা।

ইতিহাসের দিকে যদি তাকাই তাহলে ১৮২৩ শে প্রকাশিত 'নববাবু বিলাস' এর নাম করা যেতে পারে। তার ঠিক আগেই একই লেখকের লেখা আর একটি রচনার পরিচয় পাওয়া যায় — 'কলকাতা কমলালয়।' নাম শুনেই বুঝতে অসুবিধা হয়না যে হঠাৎ গভীরে ওঠা বাবু সমাজের বিলাসিতার জিনিসটি কিংবা ইংরেজদের নিজের সুবিধার জন্য বাণিজ্যিক তোলা শহর কলকাতার রমরম বাজার কারা জমিয়ে রেখেছিল। বিচ্ছিন্ন ঘটনার সংযোজন এখানে কোন কাহিনী পাঠককে উপহার দিতে না পারলেও নারীর সামাজিক অবস্থান কত সংকুচিত করে দেওয়া হয়েছে তা সহজেই বোঝা যায়।

'আলালের ঘরের দুলালে'ও এভাবে কতগুলো চুক্রো ছবির মাধ্যমেই নিষ্কৃতভাবে উনিশ শতকের সমাজ উঠে এসেছে। মতিলালের ভাবার বাধ্য হওয়ার দিকেই লেখকের নজর তবুও নারীকে আলালের রচয়িতা ভুলে যাননি। মতিলালের নষ্ঠ হওয়ার পিছনেও কারণ হিসেবে উপস্থিত থাকে নারীই।

তাই বাংলা উপন্যাসের উম্মেদ লগ্নে নারীর সামাজিক পরিসর নির্ধারিত হয়েছিল সেই সময়ের সামাজিক ও ঐতিহাসিক কারণের মধ্যে। প্রায় সব নক্সাতেই

৭৯
সে ছবি ফুটে উঠেছে — তা কেন না কেন সামাজিক প্রতিবাদের ফল।

হেনা কাথারিন মুলোলের ‘ফুলমণি ও করুণার বিবরণ’ আসলে খুস্তমের বিশ্বাসী ধর্মপ্রাণ এবং ধর্মের জন্য নিবেদিত একটি চিত্র। তবে লেখিকার বৈশিষ্ট্য এখানেই যে অন্যরা যেখানে শহর কলকাতাকে কেন্দ্র করে টুকরো খবর পরিবেশন করেছেন লেখিকা সেখানে গ্রাম বাংলাকেই তার কাহিনীর পটভূমি হিসেবে বেছে নিয়েছেন। তবু তা উপন্যাস হয়ে উঠেনি এই কারণে যে —

“বিশেষত উপন্যাসের শেষ পর্যন্ত ঘটনা বিচিত্রভাবে,
ঘরিতের ও কাহিনী থেকে সরে এসে বাইরে থেকে
উদ্দৃতি এবং খুস্তমের মহিমা কীর্তন রচনাটিকে উপন্যাস
হতে দেয়নি।”

আমাদের পরিবর্তী অধ্যায়ে আমরা আলোচনা করব সামাজিক নক্ষত্রীতে
কিভাবে নারীর পরিসর চিহ্নিত হয়েছে এবং কেন তাদের এভাবে দেখা হয়েছে
বিভিন্ন নক্ষত্রীতে।
উল্লেখনযুক্ত

১. যোগিতা কাস্তিকুমারী দাসী প্রণীত বরিশাল রায়ের কাঠি
   ১৮২৫, ১৫ই ভাদ্র

২. এ

৩. The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal upto 1855/Dr. Quzi Abdul Mannan/Page 142.


৫. সংবাদ ও সাময়িকপত্রে উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ, ২য় খণ্ড/ষষ্ঠ পর্ব বসু/পৃষ্ঠা ২২০

৬. Prostitution in Nineteenth Century Bengal, Construction of Class Gender in Social Scientist 244-46/Ratnabali Chatterjee/Page 160.


৮. Canadian Women Studies Vol-13/Ratnabali Chatterjee/Page 51-56.


11. উনিশ শতকের বাঙালি জীবন ও সংস্কৃতি/ স্পন বসু ও ইন্দ্রজিৎ বসু সম্পাদিত/ পৃষ্ঠা ৫৩৭।